ইউনিট ১৮

পরিবহণ ও যোগাযোগ

এ ইউনিটে আমরা বাংলাদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবো। একটি দেশের উন্নতির পূর্ব শর্ত হচ্ছে উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ দিন বাংলাদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় তেমন উন্নতি হয় নাই। বর্তমানে পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের কাজ চলছে। এ পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশের পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যম ও এ গুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোকপাত করতে চাই। এ ব্যাপারে প্রথমেই আপনাদেরকে বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থার সাধারন দিক তুলে ধরা হবে। এর পর বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যম সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে।

পাঠ-১৮.১ ঃ বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধা বলতে পারবেন।

প্রথমেই আমরা বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা, এর বর্তমান অবস্থা, সমস্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে জানতে আগ্রহী। এ প্রেক্ষিতে শুরুতেই আমি বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থার একটি সাধারন চিত্র তুলে ধরবো।

পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

কোন দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকেই সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের বিশেষত ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় নদী মাতৃক বাংলাদেশে পরিবহণ ব্যবস্থায় পিছিয়ে থাকলেও গত এক দশকে এর উন্নয়নের চেষ্টা চলছে। পরিবহণ বাধ্যমের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থাকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা- স্থল, নৌ ও আকাশ পরিবহণ। স্থল পরিবহণ আবার দুই প্রকার; যথা - রেলপথ ও সড়ক পথ। নদী মাতৃক বাংলাদেশের উপর দিয়ে অসংখ্য নদ-নদী জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। এছাড়াও এখানে অসংখ্য খাল-বিল রয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশে স্থল পরিবহণ অপেক্ষা নৌ পরিবহনের গুরুত্ব বেশী। বিশেষতঃ বর্ষাকালে বাংলাদেশের বেশ কিছু জেলায় নৌ পরিবহণই প্রধান পরিবহণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি থানার সাথে জেলার সরাসরি কোন সড়ক সংযোগ নাই। যেনম- কিশোরগঞ্জ জেলার সাথে এর চারটি উপজেলার (ইটনা, মিঠামহন, নিকলি ও অষ্টগ্রাম) পরিবহণ যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে নৌপথ নির্ভর। নিম্নে বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থার প্রধান ভাগ ও উপভাগগুলি দেখানো হলো ঃ

> বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত যথা- স্থল, নৌ ও আকাশ পথ

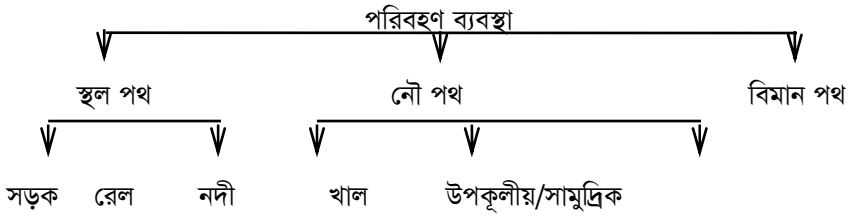

রেলপথ, সড়কপথ, নৌপথ ও আকাশ পথের সমন্বয়ে দেশে পরিবহণ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। যদিও পরিবহণ ব্যবস্থার গতিধারার পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের উন্নয়ন পরিক্রমায় এসব উপ-খাতের পারস্পরিক গুরুত্ব ও পরিবর্তিত হচ্ছে, তথাপি প্রতিটি উপ-খাতই এখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি?

বাংলাদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধাসমূহ

বাংলাদেশ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক হতে যথেষ্ট অনুন্নত। সুষ্ঠু পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবহেতু এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য এ দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পশ্চাতে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো ঃ

(১) **ভূ-প্রকৃতি** ঃ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ী এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশ সমতল ভূমি দ্বারা বিস্তার লাভ করেছে। সমতল ভূমিতে আবার অসংখ্যা নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর প্রভৃতি জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। এর ফলে এদেশে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত ব্যায় বহুল। কারণ নদ-নদী বা খাল-বিল ইত্যাদির উপর এতো ব্যাপক সংখ্যক ব্রীজ বা কালভার্ট নির্মাণ করা বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের পক্ষে অসম্ভব।

(২) **জলবায়ু** ঃ এ দেশের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রে জলবায়ুকে একটি সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশের মাটি পলিমাটি হওয়ায় অতি বৃষ্টিপাতের ফলে ব্যাপক হারে ক্ষয়সাধন সংঘটিত হয়। ফলে রাস্তাঘাট অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবহারের বা চলাচলের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে।

(৩) **নদীর ভাঙ্গন** ঃ বাংলাদেশের যে সমস্ত নদী, উপনদী বা শাখানদী প্রবাহিত হচ্ছে তাদের স্রোতের বেগে বা ঢেউয়ে আঘাত নদী উপকূল ভেঙ্গে যায়। ফলে পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় - ফুলছড়ি, আরিচা, নগরবাড়ি প্রভৃতি ঘাট নদীর প্রবল স্রোতের চাপে প্রায়ই হুমকির সম্মুখীন হয়। এজন্য দেশে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি ব্যহত হয়।

(৪) **বন্যা** ঃ বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য বন্যা প্রায় বাৎসরিক রুটিনে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিবছরই বাংলাদেশের কোন না কোন অংশে বন্যার ফলে রাস্তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন স্থানের রাস্তা স্রোতের টানে ভেসে যায়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় - ১৯৮৭, ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যা বাংলাদেশের সড়ক ও রেলপথের মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

(৫) **অপ্রতুল যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থা** ঃ বাংলাদেশে লোকসংখ্যার তুলনায় রেলপথ, সড়কপথ ও নৌপথের পরিমান খুবই সামান্য। বর্তমানে এদেশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রানাধীন ২০ হাজার কিলোমিটারের (কি.মি.) অধিক সড়ক রয়েছে, ২৭০৬ কি.মি. দীর্ঘ রেলপথ ও ৩৮৬৫ কিলোমিটার জলপথ রয়েছে। উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহর ও বন্দর গুলি কেবল রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। সড়কপথের প্রায় অধিকাংশই কাঁচা ও অনুন্নত। পাকা ও উন্নত ধরনের সড়কপথ প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম। নদীপথ বা জনপথই দেশের প্রধান পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ নদীতে পলিজমে নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় জলযান চলাচলের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পথে যানবাহনের সংখ্যাও কম।

(৬) **শহর কেন্দ্রীক পরিবহণ ব্যবস্থা** ঃ বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা মূলতঃ শহরকেন্দ্রীক বলে শুধু শহর, গঞ্জ ও বন্দর এলাকাতে উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু সুদূর পল্লী বা গ্রাম এলাকায় ইহার অবস্থা খুবই অনুন্নত।

(৭) **পরিবহণ ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা** ঃ বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা বেশ অনিশ্চিত। অর্থাৎ দেশের পরিবহণ সমূহের মধ্যে ট্রাক, লরী, বাস, ট্রেন, কোচ, লঞ্চ, স্টীমার প্রভৃতি যথাসময়ে বা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চলাচল করতে দেখা যায় না।

(৮) **বর্ষাকালে পরিবহণের অসুবিধা** ঃ বর্ষাকালে বাংলাদেশের বহু সংখ্যক সড়ক ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেলপথ ও জলমগ্ন হয়ে যায় বলে সড়ক ও রেলপথের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হয়। ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধা হয়। বর্ষায় কাঁচা রাস্তাগুলি যাতায়াত ও পরিবহনের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়ে। এমনকি এ সময় আকাশ মাঝে মাঝে এমন মেঘাচ্ছন্ন থাকে যার ফলে বিমান পথের ও যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

(৯) **পরিবহণ ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রকার মালিকানা ঃ** বাংলাদেশের রেলপথ কেবল সরকারী মালিকানায় পরিচালিত। অন্যান্য যানবাহনের প্রায় অধিকাংশই বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত হয়। ফলে বেসরকারী মালিকানার তুলনায় সরকারী মালিকানায় পরিচালিত যানবাহনের সংখ্যা অনেক কম। যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থার বেশীর ভাগ বেসরকারী মালিকানাধীন থাকার দরুন ইহাদের সেরূপ উন্নতি হয়নি। ইহা ছাড়া বাস ও লঞ্চের মালিকগণ অনেকসময় যাত্রীদের নিকট হতে ইচ্ছামত ভাড়া আদায় করে থাকে।

(১০) **ভাড়ার হার নির্ধারণে অনিয়ম ঃ** বাংলাদেশের বিভিন্ন পথে চলাচলকারী যানবহানের বিশেষ করে সড়ক ও জলপথে ভাড়ার হার নির্ধারণে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধি নাই। খেয়াল খুশিমত মালিকরা তাদের যানবাহনের ভাড়ার হার নির্ধারণ করে। ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। ইহার দরুন পরিবহনের উন্নতিতে বাঁধার সৃষ্টি হয়।

(১১) **প্রয়োজনীয় রেলষ্টেশন ও জেটির অভাব ঃ** অপর্যাপ্ত রেল ষ্টেশন, নৌ-পথে জেটি ও বন্দরের অভাব এ দেশের পরিবহণ ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি।

(১২) **পরিবহনে সরকারী নীতিমালার অভাব ঃ** বাংলাদেশের পরিবহনের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সরকারী নীতিমালার অভাব রয়েছে। এ জন্য এ দেশে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ততটা উন্নতি হয়নি।

পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা সমূহ কি কি?

পাঠ সংক্ষেপ

পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরে দেশের উন্নয়ন অনেকাংশ নির্ভরশীল। বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা যথেষ্ট অনুন্নত, তবে বর্তমানে ব্যপক উন্নয়ন চলছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন ঃ

১। বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) ২ ভাগ খ) ৪ ভাগ গ) ৬ ভাগ

২। বাংলাদেশে জল পথের পরিমান কত কি.মি.?

ক) ৩৮৬৫ কি. মি. খ) ৩৮৬০ কি. মি. গ) ৩৫৬৫ কি. মি.

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থাকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

২. পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় গুলো কি কি?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের পরিবহন ব্রবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরন দিন। পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধাসমূহ লিখুন।

পাঠ-১৮.২ ঃ নৌপথ এর গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ বাংলাদেশের নৌপথ সম্পর্কে ধারনা পাবেন;

☞ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন জলপথের বিবরণ দিতে পারবেন;

☞ বাংলাদেশের নৌপথের গুরুত্ব বলতে পারবেন।

এ পাঠে আমরা বাংলাদেশের নৌপথ সম্পর্কে আলোচনা করবো। এক্ষেত্রে নৌপথের বিবরণ, বিভিন্ন নৌ রুট, নৌপথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ ব্যবস্থা, বাংলাদেশের নদী বন্দর সমূহ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের সংস্থা, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৌ পরিবহনের গুরুত্ব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো।

২.১ নৌপথ বা জলপথ (River Ways)

নদীমাতৃক বাংলাদেশে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়, নালা প্রভৃতি জালের ন্যায় ছড়িয়ে আছে। যেমন- পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলী, এবং এদের শাখানদী, উপশাখানদী সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে। ফলে বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে নদীপথই সবচেয়ে ব্যস্ততম পথ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ দেশের ব্যবসা-বানিজ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি নদী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, জলপথ বা নৌপথ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

> বাংলাদেশে দুই প্রকার জল পথ রয়েছে, নদী বা খাল পথ এবং উপকূলীয় সামুদ্রিক পথ।

বাংলাদেশে দুই প্রকার জলপথ রয়েছে; যথা-

(ক) নদী ও খালপথ এবং (খ) উপকূলীয় সামুদ্রিক পথ।

২.২ আভ্যন্তরীণ জলপথ বা নদীপথের বিবরণ

> নদী পথেই বাংলাদেশের ৭৫% ভাগ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও যাত্রী পরিবহন সম্পাদিত হয়।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীপথই প্রধান পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা। দেশের সমগ্র অঞ্চল ব্যাপিয়া পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলী, সুরমা, কুশিয়ারা, মাতামুহুরী, আত্রাই, মধুমতী, গড়াই, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, মাথাভাঙ্গা, মহানন্দা, তিস্তা প্রভৃতি বহু নদ-নদী, শাখানদী, উপনদী ছড়িয়ে রয়েছে। এ সকল নদ-নদীর প্রায় অধিকাংশই নৌ-চলাচলের উপযোগী।

নদীপথেই বাংলাদেশের ৭৫% ভাগ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং যাত্রী পরিবহণ কার্য সম্পাদিত হয়। বর্ষাকালে এদেশে নদীপথের দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৯৮৩৩ কিলোমিটার। এর মধ্যে প্রায় ৩৮৬৫ কিলোমিটার নৌপথে বৎসরের সব সময় নৌযানসমূহ চলাচল করে এবং অবশিষ্ট ৫৯৬৮ কিলোমিটার নৌপথ শুধু বর্ষার মৌসুমে নৌযান চলাচলের উপযোগী থাকে। এদেশের নদীপথে দেশীয় ছোট ছোট নৌকা হতে শুরু করে লঞ্চ, ষ্টীমার, নৌ-ট্রাক ইত্যাদি নানা ধরনের যানবাহন যাতায়াত করে। পণ্য ও যাত্রীবাহী পৃথক পৃথক জলযান আছে যারা অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচল করে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন রুট সমুহকে নিম্নে অঞ্চল ভিত্তিতে দেখান হলো ঃ

ঢাকা অঞ্চল

ঢাকা - চাঁদপুর	ঢাকা মাদারীপুর-চরমুগরিয়া
ঢাকা মুন্সিগঞ্জ	ঢাকা - ঘিওর
ঢাকা বরিশাল-খুলনা	ঢাকা - কমলাঘাট-ভাগ্যকূল
ঢাকা - বরিশাল-পটুয়াখালী	ঢাকা - গোপালগঞ্জ
ঢাকা - বরিশাল - বাগেরহাট	ঢাকা - সাভার - এলাসিন
ঢাকা - নারায়নগঞ্জ - চাঁদপুর-গোয়ালন্দ	ঢাকা - গোপালগঞ্জ - মাদারীপুর

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল

নারায়ণগঞ্জ - নরসিংদী	নারায়ণগঞ্জ - মুন্সিগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ - বাতকান্দি	নারায়ণগঞ্জ - চাঁদপুর
নারায়ণগঞ্জ - তালতলা	নারায়ণগঞ্জ - সিরাজদিখান

নারায়ণগঞ্জ - সুরেস্বর
নারায়ণগঞ্জ -দাউদকান্দি
নারায়ণগঞ্জ - মতলব
ঘোড়াশাল - কাপাসিয়া

বরিশাল অঞ্চল

বরিশাল - বাগেরহাট
বরিশাল - পটুয়াখালী-বরগুনা-গলাচিপা
বরিশাল - ভোলা
বরিশাল - পাথরঘাটা
বরিশাল - নাজিরপুর
বরিশাল - মাদারীপুর
বরিশাল - ঝালকাঠি
বরিশাল - খুলনা

খুলনা অঞ্চল

খুলনা - দৌলতপুর - দলগ্রাম
খুলনা - দৌলতপুর - নলডাঙ্গা
খুলনা - মানিকদহ
খুলনা - মঙ্গলা - বাগেরহাট
খুলনা - সাতক্ষীরা
খুলনা - ফরিদপুর

চট্টগ্রাম অঞ্চল

চট্টগ্রাম - চাদঁপুর
চট্টগ্রাম - সন্দ্বীপ
চট্টগ্রাম - কতুবাদিয়া-কক্সবাজার
রাঙ্গামাটি - কাপ্তাই

সিলেট অঞ্চল

সিলেট - সুনামগঞ্জ
সিলেট - টেকেরহাট
সিলেট - কানাইয়ের ঘাট
ছাতক - মোহনগঞ্জ

উত্তরাঞ্চল

নওগাঁ - মহাদেবপুর
গোয়ালন্দ - জনগন্নাথগঞ্জ
নগরবাড়ী - সিরাজগঞ্জ
বাহাদুরাবাদ - রৌমারি
কুড়িগ্রাম - ভুরঙ্গামারী
সিরাজগঞ্জ - সোনামুখী

উপরে বর্ণিত নদীপথ গুলিতে সর্বদা দেশীয় নৌকা, লঞ্চ, বজরা, স্টীমার প্রভৃতি জলযান চলাচল করে।

বর্তমানে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণে কয়টি রুট রয়েছে?

যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা

নৌপথে দেশের বর্তমান প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তথা জনসাধারণের সার্বিক সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থা নিম্ন বর্ণিত নৌপথসমূহ নিয়মিত পরিচালনা করে আসছে ঃ

(১) ঢাকা - খুলনা রকেট সার্ভিস
(২) ঢাকা - বরিশাল রকেট সার্ভিস
(৩) ঢাকা - কুতুবদিয়া সার্ভিস
(৪) হাতিয়া - চরজব্বর সার্ভিস
(৫) পুটয়াখালী - খেপুপাড়া সার্ভিস
(৬) কক্সবাজার - মহেশখালী সার্ভিস
(৭) নারায়ণগঞ্জ - খুলনা সার্ভিস
(৮) চট্টগ্রাম - চিলমারী সার্ভিস
(৯) চট্টগ্রাম - হাতিয়া এক্সপ্রেস সার্ভিস
(১০) চট্টগ্রাম - বরিশাল সার্ভিস
(১১) পটুয়াখালী - আমতলী সার্ভিস
(১২) কুমিরা - গুপ্তচরা সার্ভিস

লঞ্চ সার্ভিস

বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীতে সর্বদা লঞ্চ চলাচল করে। তবে শীতকালে ছোট ছোট নদীগুলোতে লঞ্চ চলাচল প্রায় বন্ধ থাকে। রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দেশের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দরের মধ্যে সর্বদা লঞ্চ সার্ভিস চালু আছে। উপরেবর্ণিত নৌপথসমূহে সর্বদা স্টীমার ও লঞ্চ সার্ভিস পরিচালনা ছাড়া ও যাত্রী পরিবহণ সংস্থা দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের সঙ্গে অন্যান্য জেলার সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষার্থে আরিচা-নগরবাড়ী, আরিচা-দৌলতাদিয়া এবং সিরাজগঞ্জ-ভুয়াপুর ফেরি সার্ভিস নিয়মিত পরিচালনা করে আসছে।

বাংলাদেশের নদী বন্দর সমূহ

বাংলাদেশের নদী বন্দরগুলির মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, মুন্সিগঞ্জ, বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, জগন্নাথগঞ্জ, গোয়ালন্দ, ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, খেপুপাড়া, মাদারীপুর, বাঘাবাড়ী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের নৌপথে ব্যবহৃত নৌযান ও যাত্রী ও কার্গো সম্পর্কিত তথ্যাবলী সারণী ১৮.২.১ এবং এ খাত থেকে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে শুধুমাত্র বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থায় অর্জিত আয় সারণী ১৮.২.২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ১৮.২.১ ঃ বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নৌপরিবহণের কার্যক্রম

বছর	বর্ষা মৌসুমে (কি.মি.)	শুষ্ক মৌসুমে (কি.মি.)	যাত্রীর সংখ্যা (মিলিয়ন)				কার্গো হ্যান্ডলিং
			মোটর লঞ্চ দ্বারা	স্টীমার দ্বারা	ফেরী সার্ভিস দ্বারা	মোট	এর আয়তন (মিলিয়ন টন)
১৯৯০-৯১	৫৯৬৮	৩৮১৪	২৪.৪৪	৬.৪৬	-	৩০.৯০	৩.৮২
১৯৯১-৯২	৫৮৯৬	৩৭৯৩	৩৪.৭০	০.৭৩	৬.৬৯	৪২.১২	৪.৪৯
১৯৯২-৯৩	৫৮৯৬	৩৭৯৩	৪২.৬২	৬.২৭	০.৬০	৪৯.৪৯	৪.৬০
১৯৯৩-৯৪	৫৯৬৮	৩৮৬৫	৪৭.৮৩	০.৬১	৭.৮৫	৬৬.২৯	৪.৯৪
১৯৯৪-৯৫	৫৯৬৮	৩৮৬৫	৫৭.১০	০.৬৭	৯.১১	৬৬.৮৮	৫.১৫
১৯৯৫-৯৬	৫৯৬৮	৩৮৬৫	৫৮.১৭	০.৯৫	৮.৮৯	৬৭.৭২	৫.৬৯

Source : Statistical Year Book of Bangladesh, 1997.

সারণী ১৮.২.১ থেকে লক্ষ্যনীয় যে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত লঞ্চ এবং স্টীমারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফেরী সার্ভিসও সম্প্রসারিত হয়েছে। এ সময়ে কার্গো পরিবহনের আয়তন প্রায় দ্বিগুনের কাছাকাছি পৌঁছেছে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশান কর্তৃক যাত্রী, ফেরী এবং কার্গো সার্ভিস থেকে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না আসলেও সাফল্য অব্যাহত আছে (সারণী ১৮.২.২)।

সারণী ১৮.২.২ ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন কর্তৃক যাত্রী পরিবহণ ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব।

বছর	যাত্রী সার্ভিস			ফেরী সার্ভিস				কার্গো সার্ভিস	
	যাত্রীর সংখ্যা (০০০ জন)	কার্গো (০০০ টন)	মোট উপার্জন (লক্ষ টাকা)	যাত্রীর সংখ্যা (০০০ সংখ্যা)	যানের সংখ্যা (০০০)	কার্গো (টন)	মোট উপার্জন	কার্গো (০০০ টন)	মোট উপার্জন (লক্ষ টাকা)
১৯৯০-৯১	৬৮০	২০	২৯৪	৫৮১৪	৫৯৩	১০০০	৩০৪৯	৩১০	৭৬১
১৯৯১-৯২	৭২৬	২২	৩২৪	৫৯৬৮	৬০৬	১০০০	৩৪০৭	৩৩৮	৮০৬
১৯৯২-৯৩	৬০৬	২৪	৩৩৬	৭০২৯	৬৮৬	১০০০	৪৮৫০	২৪২	৫৪৬
১৯৯৩-৯৪	৬১১	২৪	৩৫৮	৭৮৫২	৭৭৮	১০০০	৫৪৭৪	২৫৫	৫০৯
১৯৯৪-৯৫	৬৭২	২৪	৩৬১	৯১১৭	৪৪৯	১০০০	৫৯৪২	২৭২	৬২২
১৯৯৫-৯৬	৬৫৫	২৩	৩৮৯	৪৪৯৪	৯২০	১০০০	৬১৩০	২৩৬	৬১২

Source : Statistical Year Book of Bangladesh, 1997.

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থা ও শিপিং কর্পোরেশন

(ক) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থা ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮সালে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থা গঠন করা হয়। সংক্ষেপে ইহা আই.ডবি-উ.টি.এ (IWTA) নামে পরিচিত।

১৯৫৮ সালে অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থা গঠন করা হয়।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের পাশাপাশি দেশের সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে (১৯৯৮) সংস্থার মোট জলযান সংখ্যা ২৫৬টি। এর মধ্যে ২০০টি বাণিজ্যিক জলযান ও ৫৬টি সহায়ক জলযান। ২০০টি জলযানের মধ্যে ২৪টি যাত্রীবাহী জাহাজ, ৩৪টি ফেরী, ১২টি তেলবাহী জাহাজ, ১৮টি কোষ্টার, ১০টি স্বয়ং ক্রিয় অভ্যন্তরীণ বার্জ, ৩৪টি উপকূলীয় ডাম্ববার্জ, ৩১টি ডাম্ববার্জ, ২টি অভ্যন্তরীণ ডাম্বফ্লাট ও ৩৫টি ডাগ অন্তর্ভূক্ত। তবে ২০০টি বাণিজ্যিক জলযানের মধ্যে বর্তমানে ৪২টি জাহাজ অকেজো ও ৮টি জলযান রূপান্তর প্রক্রিয়ায় থাকায় ১৫০টি জলযান চলাচল উপযোগী রয়েছে। এর মধ্যে ৪০% গড়ে মেরামত/সার্ভেতে থাকে এবং ৬০% বাণিজ্যিক কাজে নিয়োজিত থাকে। ৫৬টি সহায়ক জলযানের মধ্যে ৭টি অভ্যন্ত রীণ ডাম্ববার্জ, ২২টি ঘাট/পল্টুন, ৩টি ক্রেনবোট, ৬টি ভাসমান কারখানা, ৭টি বন্দর ডিউটি লঞ্চ, ৫টি এম. এল. বি এবং ৬টি বিবিধ।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন জনস্বার্থে ও জন কল্যাণমূলক সার্ভিস হিসাবেই উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রীবাহী সার্ভিস চালু রেখেছে। তবে বিগত বছরগুলিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন ক্রমাগতভাবে লোকসানের সম্মুখীন হলেও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে প্রতি বছর এর আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লোকসানের পরিবর্তে নীট লাভ বাড়ছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সংস্থা আনুমানিক ১.৫১ কোটি টাকা এবং ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ৯.০৬ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত বিগত ছয় বছরের আয়-ব্যয় সম্বলিত বিবরণী সারণী ১৮.২.৩ এ দেখানো হলো।

সারণী ১৮.২.৩ ঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশনের বিগত ছয় বছরের আয় ও ব্যয়।

বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	অপারেশনাস লাভ (+) / ক্ষতি(-)	সুদ ও অপচয়	নীট লাভ (+)/ক্ষতি (-)
১৯৯১-৯২	৪৯.৬৫	৪৭.৫৯	(+) ২.০৬	৮.৯৫	৬.৮৯
১৯৯২-৯৩	৬০.৮৪	৫৩.৪৯	(+) ৭.৩৫	১০.৩৬	৩.০১
১৯৯৩-৯৪	৬৫.৪৭	৫৭.৯১	(+) ৭.৫৬	১০.৫০	২.৯৪
১৯৯৪-৯৫	৭২.১৮	৫৮.১৫	(+) ১৪.০৩	১৪.৭৫	০.৭২
১৯৯৫-৯৬	৭৩.৮৯	৫৯.৪৮	(+) ১৪.৪১	১২.৯০	১.৫১
১৯৯৬-৯৭	৮৬.৭৬	৬৪.৬৪	(+) ২২.১২	১৩.০৬	৯.০৬

উৎস ঃ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৮

বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ সংস্থার ভূমিকা কি?

(খ) বাংলাদেশ শির্পিং কর্পোরেশন ঃ ১৯৭২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)-র সমুদ্র পথে নিজস্ব বহরে আমদানি- রপ্তানিযোগ্য পণ্য পরিবহণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং অন্যান্য কার্যক্রমসহ লাইনার সার্ভিসে যোগদান করে। প্রতিষ্ঠা লগ্নে বিএসসি-র নিজস্ব কোন জাহাজ ছিল না। বিএসসি-র জাহাজ বহর (ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ পর্যন্ত) ২,৩৯,৬৯৩ ডি.ডবি-উ.টি ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ১৬টি জাহাজের একটি মিশ্র বহর রয়েছে। এর মধ্যে ২টি লাইটারেজ ট্যাংকার এবং ১৪টি সাধারণ/বহুমুখী পণ্যবাহী জাহাজ। বর্তমানে বিএসসি-র জাহাজ বহর নিম্নবর্ণিত সমুদ্র পথে চলাচল করেঃ

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ১৯৭২ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(১) বাংলাদেশ/যুক্তরাজ্য আন্তঃমহাদেশীয়/আফ্রিকা বাণিজ্য পথ;

(২) বাংলাদেশ/দূরপ্রাচ্য/জাপান বাণিজ্য পথ;

(৩) বাংলাদেশ/পাকিস্তান/পশ্চিম এশিয়া উপসাগরীয় অঞ্চল/লোহিত সাগর বাণিজ্য পথ;

(৪) বাংলাদেশ সিঙ্গপুর ফিডার সার্ভিস।

বিএসসি তার নিজস্ব জাহাজ বহরের সাহায্যে দেশীয় আমদানি-রপ্তানি পণ্যের ১৫% পরিবহণ করতে সক্ষম। ১৯৯৭/৯৮ অর্থ বছরের ১লা জুলাই ১৯৯৭ হতে ৩১শে ডিসেম্বর ৯৭ পর্যন্ত বিএসসি দেশীয় মোট আমদানি পণ্যের ১১..৭০% এবং মোট রপ্তানি পণ্যের ৫.৬৯% বহন করছে। ১৯৯৭/৯৮ সালের প্রথম ছয় মাস এবং বিগত ৪ বছরের দেশের মোট পরিবাহিত আমদানি রপ্তানি পণ্যের পরিমান ও বিএসসি-র শেয়ার সারণী ১৮.২.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণী ১৮.২.৪ ঃ ১৯৯৩-৯৪ হতে দেশের মোট পরিবাহিত আমদানি রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ ও বিএসসি-র শেয়ার।

বছর	আমদানি			রপ্তানি		
	দেশের মোট	বিএসসি-র শেয়ার	শতাংশ	দেশের মোট	বিএসসি-র	শতাংশ
১৯৯৩-৯৪	৮১.৯২	১৫.১৬	১৮.৫০	১৪.৪০	২.০১	১৩.৯৬
১৯৯৪-৯৫	১১০.৩৪	১৮.২৪	১৬.৫৩	১৭.৩৮	২.৪০	১৩.৮১
১৯৯৫-৯৬	১১৩.২১	১৫.৩২	১৩.৪৬	১৮.৩২	২.৮৭	১৫.৬৭
১৯৯৬-৯৭	১১২.৮৯	১৬.৩২	১৪.৪৬	১৯.৩২	২.৪৫	১২.৬৮
১৯৯৭-৯৮ (ডিসেম্বর ৯৭ পর্যন্ত)	৫৭.০১	৬.৬৭	১১.৭০	১০.৯০	০.২৬	৫.৬৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৮

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ২০০৫ সাল নাগাদ অধিকতর পণ্য পরিবহণের উপযোগী বিভিন্ন আকারের ২৪টি জাহাজের একটি মিশ্র বহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বৈদেশিক মুদ্রায় তহবিল যোগান সম্ভব হয়নি বলে ১৯৯১/৯২ হতে অদ্যাবধি বিএসসি-র পক্ষে কোন জাহাজ অর্জন সম্ভব হয়নি।

আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ভূমিকা কি?

নৌপথের গুরুত্ব

(ক) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নৌপরিবহণের গুরুত্ব ঃ নদী মাতৃক বাংলাদেশে অসংখ্য নদী, শাখা-উপশাখা নদী রয়েছে। সঙ্গত কারণেই দেশের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ জলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। এক সময় এদেশের সবগুলি নদীতেই প্রায় সারা বৎসর পানি থাকতো এবং নদীগুলোও ছিল নাব্য। কিন্তু বর্তমানে গঙ্গার (পদ্মা) মতো আন্তর্জাতিক নদীসহ প্রতিটি নদীর উজানে প্রতিবেশী দেশ ভারত সরকার আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বাঁধ দিয়ে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। ফলে শুস্ক মৌসুমে দেশের সমস্ত নদীতে আর পানি থাকে না। পদ্মার মতো বড় নদীতে ও শুস্ক মৌসুমে স্থান বিশেষে হেঁটে অতিক্রম করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই নৌযান চলাচল বিঘ্নিত হয়। তা সত্ত্বে তবুও এ পথের গুরুত্ব কম নয়। নিম্নে অভ্যন্তরীণ জলপথের গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) স্বল্প ব্যয়ে পরিবহণ ঃ বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ জলপথ স্বাভাবিক যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থা এবং এ পথে পরিবহণ ও যাতায়াত খরচ খুবই কম। ফলে জলপথেই দেশের ৭৫% ভাগ আভ্যন্তরীণ যাত্রী ও বাণিজ্য পরিবহণ কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(২) আর্থিক দিক হতে জলপথ ঃ জলপথ বা নৌপথের কোন নির্মাণ খরচ নেই এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ও অনেক কম। সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ যেমন ব্যয়বহুল তেমনই ইহার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ও যথেষ্ট। এ কারণে অন্য যে কোন পরিবহণ ব্যবস্থা অপেক্ষা নৌপথ আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক।

(৩) অবিনশ্বর ঃ জলপথ অবিনশ্বর। ইহার কোন রকম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। যেমন - বলা যেতে পারে জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ইত্যাদির ফলে অন্যান্য পথ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু জলপথ সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় থাকে।

(৪) অনেক সময় নৌপথই একমাত্র অবলম্বন ঃ বর্ষাকালে বন্যা দেখা দিলে বাংলাদেশের অনেক রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে যায়। সে সময় জলযানই চলাচল ও পণ্য পরিবহনের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। আবার উপকূলীয় বা দ্বীপাঞ্চলের কোন কোন স্থানে নৌপথেই পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের একমাত্র মাধ্যম।

(৫) ভারী পণ্য পরিবহণ সহজ ঃ অন্যান্য যে কোন পরিবহণের তুলনায় নৌপথে ভারী পণ্য একস্থান হতে অন্যস্থানে অতি সহজে স্থানান্তরিত করা যায় এবং এ পথে পরিবহণ ব্যয় ও কম। পক্ষান্তরে সড়ক বা রেলপথে ভারী পণ্য স্থানান্তরিত করা যেমন অসুবিধাজনক তেমনি ব্যয় বহুল।

(৬) কৃষি উন্নয়ন ঃ কৃষির উন্নয়ন সাধনে নৌপথের গুরুত্ব ব্যাপক। সুলভ ও সহজ পরিবহণ ব্যবস্থা ছাড়া কৃষিকার্যে উন্নতি হয় না এবং এ সুবিধা প্রদান করে থাকে নৌপথ। কৃষিক্ষেত্রে বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি, শ্রমিক প্রভৃতি সরবরাহের ক্ষেত্রে এবং উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণে সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র সুলভ নৌপথের সুবিধা থাকায় এখানে কৃষির উন্নয়ন সহজ হয়েছে।

(৭) পানি নিস্কাশন সহজ ঃ দেশের পানি নিস্কাশনের ক্ষেত্রে নৌপথের গুরুত্ব অপরিসীম। রেলপথ ও সড়কপথ নির্মাণ করে শুধু পণ্য বা যাত্রী চলাচলের সুবিধা হয়। কিন্তু ঐগুলি দ্বারা পানি নিস্কাশন সম্ভব নহে বরং পানি নিস্কাশনে বাঁধার সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে নৌপথের মাধ্যমে পানি নিস্কাশন হয়। সে জন্য দেশের নদীপথকে আরও সংস্কার করে পানি নিস্কাশনের আরও জোরালো ব্যবস্থা করা দরকার। তাহলে বন্যার আশংকা বহুলাংশ হ্রাস পাবে।

(৮) ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঃ বাংলাাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য নদী পথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সহজে ও সুলভে পণ্য পরিবহনের কাজে নদী পথ অন্য যে কোন পরিবহণ ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশী উপযোগী। তাই বাংলাাদেশের প্রায় সকল হাট, বাজার, গঞ্জ, বাণিজ্য কেন্দ্র, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতির সাথে নদী পথের সংযোগ রয়েছে।

(৯) অধিক সংখ্যক যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ ঃ নদীপথ দেশের পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে যে অবদান রাখে তা দেশের অন্য কোন পরিবহণ দ্বারা আশা করা যায় না। নদী পরিবহনের মাধ্যমে বাংলাাদেশের মোট পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ যাত্রী ও পণ্য পরিবাহিত হয়।

(১০) শিল্পের কাঁচামাল পরিবহণ ঃ দেশের শিল্পকেন্দ্র সমূহের অধিকাংশ কাঁচামাল পরিবাহিত হয় নদীপথের মাধ্যমে। কারণ এ পথের মাধ্যমে অতি অল্প খরচে প্রেরণ সম্ভব হয়। আবার শিল্পজাত দ্রব্য ও এ পথে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ হয়।

(১১) শিল্পোন্নয়ন ঃ শিল্পের উন্নয়ন সাধনে ও এ পথের যথেষ্ট অবসান রয়েছে। নদীপথে শিল্পের কাঁচামাল সুলভে সংগ্রহ করা যায় এবং শিল্পজাত দ্রব্য ও অল্প খরচে দেশের বিভিন্ন বাজারে প্রেরণ করা হয়। তাই দেশের শিল্প উন্নয়ন ও নৌপথের উপর নির্ভরশীল।

(১২) খাদ্যশস্য প্রেরণ ঃ নদীপথে খাদ্যশস্য প্রেরণের পেছনে যথেষ্ট অবদান রাখে। এ পথের মাধ্যমে অল্প খরচে সুদূর পল্লী বা গ্রাম অঞ্চল হতে দেশের বিভিন্ন শহরে বা গঞ্জে বা হাটে বাজারে প্রেরণ করা হয়।

(১৩) কর্মসংস্থান ঃ নদীপথে কর্মসংস্থান যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কারণ এ পথে বহুসংখ্যক লোক নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

(১৪) মৎস্য সম্পদ আহরণ ঃ মৎস্য সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে নদীপথের ভূমিকা যথেষ্ট রয়েছে। এ পথে প্রচুর পরিমান মৎস্য ধৃত হয়।

(১৫) বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতেও ইহা সাহায্য করে থাকে। দেশের দুটি সামুদ্রিক বন্দরের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ নদীপথের সংযোগ রয়েছে। চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য ও আমদানি বাণিজ্য সংঘটিত হয়। নদী পথের মাধ্যমেই রপ্তানিযোগ্য পণ্য বন্দরে প্রেরিত হয় আবার আমদানিকৃত পণ্য নদীপথের মাধ্যমেই দেশের বিভিন্ন অংশে স্থানান্তর করা হয়।

(১৬) বাণিজ্য কেন্দ্রের সৃষ্টি ঃ নদীপথ বাণিজ্য কেন্দ্রের সৃষ্টি বা উৎপত্তি হতেও যথেষ্ট অবদান রাখে। নদীর উভয় তীরে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকার জন্য বহু বাণিজ্য কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় - বাঘাবাড়ী, গোয়ালন্দ নদীবন্দর এভাবে সৃষ্টি হয়েছে। নদী পথে একদিকে যেমন শিল্পের কাঁচামাল সুলভে সংগ্রহ করা যায় অন্যদিকে তেমনি শিল্পজাত দ্রব্য ও অল্প খরচে দেশের বিভিন্ন হাট-বাজারে ও বন্দরে প্রেরণ করা যায়। তাই শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উন্নতি লাভ করে। এ ক্ষেত্রে নৌপথে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করে থাকে।

(১৭) অধিক নিরাপদ ঃ বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ কিংবা বহিঃ শত্রুর আক্রমনে সড়ক ও রেলপথ অতি সহজে বিনষ্ট হয়ে যোগাযোগ অচল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জলপথ এদিক হতে নিরাপদ, ইহা সহজে নষ্ট হবার নহে। বাংলাদেশের বিশ্ব বাণিজ্য চলে চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা বন্দরের মাধ্যমে। কিন্তু এ বন্দর দুটি বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য আভ্যন্তরীণ নদীপথের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। নদীপথে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসমূহ সামুদ্রিক

বন্দরে প্রেরিত হয় এবং সেখান হতে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। আবার আমদানিকৃত দ্রব্যসমূহ সমুদ্রপথে সামুদ্রিক বন্দরে আসে এবং সেখান হতে নৌপথে দেশের বিভিন্ন বাজার ও বন্দরে প্রেরিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কেবল বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যই নয় বিশ্ব-বাণিজ্য ও নদীপথের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে আভ্যন্তরীণ নৌপথ নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নৌ পরিবহণের গুরুত্ব কতটুকু?

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশ নদী মার্তৃক দেশ বিধায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নদী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই দেশে নৌপথের গুরুত্ব অধিক। নৌ পথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ কম ব্যয় বহুল। বাংলাদেশে নৌ পরিবহণে দুইটি সংস্থা নিয়জিত। এ সংস্থা দুইটি হলো অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিনঃ

১। বাংলাদেশের জল পথ কত প্রকার?

ক) ২ প্রকার খ) ৪ প্রকার গ) ৬ প্রকার

২। নদী পথে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও যাত্রী পরিবহনের কতভাগ কার্য সম্পাদিত হয়?

ক) ৮০% খ) ৭৫% গ) ৮৫%

৩। আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ সংস্থার বর্তমান নৌযানের সংখ্যা কয়টি?

ক) ২৭০টি খ) ২৫০টি গ) ২৫৬টি

৪। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় -- ।

ক) ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ খ) ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ গ) ৫ই মার্চ ১৯৭২

৫। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ২০০৫ সাল নাগাদ অধিকতর পণ্য পরিবহনের উপযোগী বিভিন্ন আকারের কয়টি জাহাজের মিশ্র বহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে?

ক) ২০টি খ) ২৪টি গ) ২৯টি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জলপথকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি?

২. অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ কোন কোন নৌ পথ পরিচালনা করে?

৩. বাংলাদেশে নৌ পথের গুরুত্ব কি?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের নৌপথের বিবরণ দিন।

২. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নৌপরিবহনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-১৮.৩ ঃ সড়কপথ এবং রেলপথ এর গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশের সড়ক ও রেল পথের বিবরণ দিতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের সড়ক ও রেলপথের গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের সড়ক ও রেলপথ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

এ পাঠ থেকে আমরা বাংলাদেশের সড়ক পথের সামগ্রিক অবস্থা বিশেষ করে বাংলাদেশের সড়কপথ এবং এর শ্রেণী বিভাগ ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানবো।

বাংলাদেশের সড়কপথ (Roadways of Bangladesh)

বাংলাদেশের সড়কপথের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি জেলা সদরের সাথে থানা সদরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় সড়কপথই গ্রাম, শহর ও বিভিন্ন এলাকার মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। ১৯৯০-৯১ সালে পরিচালিত বাংলাদেশ সড়ক মহাপরিকল্পনা সমীক্ষা অনুযায়ী সড়ক পরিবহণ (যান্ত্রিক) শতকরা ৬৬ ভাগ পণ্য এবং শতকরা ৭৩ ভাগ যাত্রী পরিবহণ করে থাকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ পরিবহনের মধ্যে সড়ক পরিবহণ একক বৃহত্তম মাধ্যম। ইহা সম্প্রতি দেশে সড়ক পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধনেরই ফলাফল। নদীমাতৃক বাংলাদেশে সড়কপথ নির্মাণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। এক হিসাবে দেখা গেছে বাংলাদেশে গড়ে প্রতি কি.মি সড়ক নির্মাণে ৬টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের প্রয়োজন হয়; যা ব্যয় বহুল। ফলে বাংলাদেশে পাকা রাস্তার পরিমান তুলনামূলকভাবে কম। দেশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন ২০ হাজার কিলোমিটারের অধিক সড়ক রয়েছে। নীচের সারণীতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর সড়কপথ দেখানো হলো ঃ

> সড়ক পরিবহণ বাংলাদেশে শতকরা ৬৬% ভাগ পণ্য ও ৭৩ ভাগ যাত্রী পরিবহন করে থাকে।

সারণী ১৮.৩.১ ঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর সড়কপথ (কি.মি.)

বছর (৩০শে জুন পর্যন্ত)	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার রো এ টাইপ	মোট
১৯৯১	২,৯২০	১,৬৩১	৯,৫৫৩	১৪,১০৪
১৯৯২	২,৯০৮	১,৫৫৫	১০,২০৫	১৪,৬৬৮
১৯৯৪	৩,১৬৩	২,৯১১	৯,৫৯৬	১৫,৬৭০
১৯৯৫	৩,১৬৩	২,৯১১	৯,৯৯৬	১৬,০৭০

উৎস ঃ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৮

বাংলাদেশের সড়ক পথের বিবরণ (Description of Roads of Bangladesh)

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় সড়কপথ যথেষ্ট নয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশে সড়কপথের পরিমান ছিল প্রায় ৩৪৮৮০ কি.মি.। তম্মধ্যে পাকা রাস্তার পরিমান ছিল প্রায় ১৯২০ কি.মি.। সকল সময়ে যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাস্তা ছিল মাত্র ৪০০ কি.মি.। ১৯৬০ সালের পর হতে এ দেশের সড়ক পথের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং তারপর হতে সড়ক পথের উন্নতি শুরু হয়। এভাবে ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মোট সড়কপথের পরিমান ছিল প্রায় ৪,১৭৫ কিঃ মিঃ। তম্মধ্যে প্রায় ৩,৯৬০ কিঃ মিঃ ছিল পাকা ও অবশিষ্ট ছিল আধা-পাকা। এগুলি ছাড়াও জেলা পরিষদ, পৌরসভা, থানা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ প্রভৃতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রায় ৫,২০০ কিঃ মিঃ পাকা রাস্তা ছিল। এরপর হতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে সড়কপথ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে ২০ হাজার কিলোমিটারের অধিক সড়ক রয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গ্রামাঞ্চলে

> ১৯৯৫-৯৬ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের সড়ক পথের পরিমান ১৬,০৭০ কি.মি.।

কাঁচা রাস্তা রয়েছে এবং যাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয়ভাবেই সমাধান হয়। সারণী ১৮.৩.১ এ সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতাধীন ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত সড়ক পথের তালিকা দেয়া হলোঃ

সারণী ১৮.৩.২ ঃ সড়ক ও জনপথ বিভাগের অধীনস্থ সড়কপথ (কিমি. হিসাবে)

বছর	পাকা সড়ক	আধা-পাকা সড়ক	মোট সড়ক পথ
১৯৯০	৭৯১৪	৫৭১৩	১৩৬২৭
১৯৯১	৮০৫৬	৬০৪৮	১৪১০৪
১৯৯২	৮২৩১	৬২৬৯	১৪৫০০
১৯৯৩	৮৫৪৬	৬৫০৭	১৫০৫৩
১৯৯৪	৯৭০৪	৫৯৬৫	১৫৬৬৯
১৯৯৫	৯৮৪২	৬২২৮	১৬০৭০

Source : Statistical Yearbook of Bangladesh, 1997.

সড়কপথের শ্রেণী বিভাগ

বাংলাদেশের সড়কপথকে ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নিম্নে শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলোঃ

(১) জাতীয় জনপথ ঃ এ প্রকারের সড়কপথ খুবই সীমাবদ্ধ। কেবল রাজধানীর সঙ্গে বিভাগীয় শহর, জেলা শহর ও প্রধান প্রধান বন্দরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হয়েছে। এ পথের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপর ন্যাস্ত থাকে। জাতীয় জনপথগুলি বেশ চওড়া ও মজবুত। বর্তমানে এ জনপথের পরিমান ৩১৬৩ কিঃ মিঃ (১৯৯৫)।

(২) আঞ্চলিক জনপথ ঃ এ প্রকারের সড়কপথ বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা সদরকে বাণিজ্যিক ও শিল্প কেন্দ্র গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। এ পথের নির্মাণ ও দেখা শুনার কাজ সড়ক ও জনপদ বিভাগের উপর দায়িত্ব রয়েছে। বর্তমানে এ জনপথের পরিমান ২৯১১ কিঃ মিঃ (১৯৯৫)।

(৩) জেলা বোর্ড সড়ক ঃ প্রতিটি জেলার মধ্যে বেশ কিছু সড়ক থাকে যার নিয়ন্ত্রণভার জেলা বোর্ডের বা জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। বাংলাদেশে প্রায় ১৬,২৯৩ কিঃ মিঃ জেলা পরিষদ বা বোর্ড সড়ক আছে। এর মধ্যে ২,৪৯০ কিঃ মিঃ পাকা ও আধা-পাকা সড়ক আছে।

(৪) উপজেলা পরিষদ সড়কপথ ঃ বাংলাদেশে এ প্রকার সড়কপথের পরিমাণ প্রায় ২৫,৪০৭ কিঃ মিঃ। এর মধ্যে ৪৩১ কিঃ মিঃ পাকা রাস্তা। এ রাস্তার নির্মাণ কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ উপজেলা পরিষদের উপর অর্পন করা থাকে।

(৫) পৌরসভা সড়ক পথ ঃ বাংলাদেশের প্রতিটি পৌরসভার অধীনে বেশ কিছু সড়কপথ থাকে যা পৌরসভা প্রধান দ্বারা পরিচালিত। সমগ্র দেশে প্রায় ৬৫০০ কিঃ মিঃ এ প্রকারের সড়কপথ রয়েছে।

(৬) ইউনিয়ন পরিষদ সড়কপথ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের রাস্তাসমূহ এ শ্রেণীর অন্তগর্ত। এ প্রকারের পথ ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের সঙ্গে ও হাট বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ রাস্তা এ শ্রেণীর। এ রাস্তার ৯৯ ভাগই কাঁচা।

সড়ক পথকে কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সড়কসমূহ (Main Roads of Bangladesh)

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দেশের বিভিন্ন জেলা ও বন্দরের যোগাযোগ রক্ষাকারী অনেক গুলি সড়ক রয়েছে। এর মধ্যে মহানগরী ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রম্পুর, রাজশাহী, বরিশাল প্রভৃতি শহরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী সড়ক সমূহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ সকল আবার কতিপয় উপসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে।

সড়কপথের গুরুত্ব (Importance of Roads)

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়ক পথের গুরুত্ব অত্যধিক। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য সড়কপথই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে রেলপথ বা জলপথ নাই। এসকল স্থানে সড়ক পথই একমাত্র অবলম্বন। নিম্নে সড়কপথের বিভিন্নমুখী ভূমিকা আলোচনা করা হলোঃ

১. কৃষি উন্নয়ন ঃ কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতি ও কৃষি নির্ভর। তাই দেশের কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি ক্ষেত্রে বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির আনয়ন করা ও উৎপাদিত ফসলকে বাজারে প্রেরণ করার ক্ষেত্রে সড়ক পরিবহনের মাধ্যমেই সম্ভব।

২. কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ঃ সড়ক পরিবহনের উপর কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ নির্ভর করে। কারণ সড়কপথের মাধ্যমেই গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যসমূহ অর্থাৎ ধান, চাউল, তরিতরকারি, ডাল, মাছ, পাট, তামাক প্রভৃতি শহরের বাজারের অতি সহজে আনয়ন করা যায়।

৩. শিল্পোন্নয়ন ঃ বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের পশ্চাতে সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাট, ইক্ষু, কাষ্ঠ প্রভৃতি কাঁচামাল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সড়ক পথের মাধ্যমে শিল্পকেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়। আবার শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ দেশের বিভিন্ন অংশে প্রেরণের জন্য সড়কপথ যথেষ্ট অবদান রাখে।

৪. গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও শহরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উত্তম মাধ্যম হলো সড়কপথ। কারণ রেল পরিবহণ কতগুলি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সড়ক পথের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে ও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যকার ব্যবধান কমে আসে।

৫. দ্রব্যমূল্যের সমতা ঃ সড়কপথ শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল বা সমতা রাখার পশ্চাতে ও যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। কারণ বাংলাদেশে শহর ও গ্রামাঞ্চল সড়ক পরিবহণ দ্বারা সংযুক্ত থাকায় শহর হতে শিল্পপণ্য ও গ্রামাঞ্চল হতে কৃষিপণ্য দ্রুত সরবরাহ করা যায় বলে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা পায়।

৬. সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের পশ্চাতে সড়কপথের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সর্বত্র সড়কপথ প্রসার লাভ করলে গ্রাম বা পল্লী অঞ্চলে শিল্প কারখানা স্থাপন করা যায়। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধুমাত্র শহরে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের সর্বত্রই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৭. জনস্বাস্থ্য ঃ জনস্বাস্থ্য সড়ক পরিবহনের উপর নির্ভর করে থাকে। গ্রামে-গঞ্জে সড়কপথের উন্নতির সাথে সাথে পল্লী বা গ্রামের জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ইহা সম্ভব হয়েছে সড়কপথের সুযোগ সুবিধার জন্য।

৮. বনজ সম্পদের ব্যবহার ঃ সুষ্ঠু সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা থাকলে দেশের বনজ সম্পদ আহরণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয়। কারণ বন এলাকায় রেলপথ নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সড়কপথ নির্মাণ করা যায় বলে এ পরিবহনের মাধ্যমে বনজ সম্পদ আহরণ করে তার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব।

৯. কর্মসংস্থান ঃ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ও সড়ক পথের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সড়ক পথের বিভিন্ন যানবাহনে ও সড়ক ব্যবস্থাপনার কাজ করে বাংলাদেশের বহুসংখ্যক লোক জীবিকা নির্বাহ করে।

১০. সামাজিক গুরুত্ব ঃ সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জ্ঞানের বিকাশ লাভ, সামাজিক পরিবর্তন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটে থাকে।

১১. রাজনৈতিক সুবিধা ঃ সড়কপথে দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা ও জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখে।

১২. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঃ অসংখ্য ছোট-বড় হাট-বাজার বাংলাদেশের সর্বত্র রয়েছে। এ সকল হাট-বাজারের পণ্যদ্রব্য পরিবহণ করতে এবং তথা হতে অধিকতর উন্নত বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রেরণ করতে সড়ক পথের প্রয়োজন হয়। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য এর উন্নতি ও সড়কপথের উপর নির্ভরশীল।

১৩. গ্রাম্য জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঃ উন্নত সড়ক পরিবহনের মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জীবন যাত্রার মানও উন্নত হয়। কারণ, গ্রামে উৎপাদিত কৃষিপণ্য খুব সহজেই কৃষক থানা শহরে বা জেলা শহরে বিক্রীর জন্য নিয়ে যেতে পারে। ফলে, পণ্যের উচ্চদাম নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া, কৃষি আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ও শহর থেকে সংগ্রহ করা সহজ হয়। এতে উন্নত কৃষি উৎপাদন ও বিপনন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে সড়ক পথের গুরুত্ব কি

পাঠ সংক্ষেপ

বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন, কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ, শিল্পোন্নয়ন, গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ, দ্রব্য মূল্যের সমতা ইত্যাদি কারণে সড়ক পথের গুরুত্ব অধিক। কিন্তু নদী মার্তৃক দেশ হওয়ায় সড়ক তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রতি কি.মি. সড়ক নির্মাণে গড়ে ৬টি কালভার্ট নির্মাণ করতে হয়।

রেলপথ এবং এর গুরুত্ব

পরিবহণ যোগাযোগ ব্যবস্থার রেল পথের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেল পথ কতটুকু ভূমিকা রাখছে? আর বর্তমানে রেল পথের অবস্থা কি? আসুন আমরা এ পাঠ থেকে এ বিষয় গুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

বাংলাদেশের রেলপথ (Railways of Bangladesh)

ভারত বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে (১৯৪৭) মাত্র ২,৭০৬ কিঃ মিঃ রেলপথ ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য ২৭০৬ কিঃ মিঃ (১৯৯৭)। এ পরিসংখ্যান হতে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৪৭ সাল হতে বর্তমান পর্যন্ত দেশের রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটে নাই। বাংলাদেশে রেলপথের পরিমান অল্প হলেও ইহা দেশের অন্যতম প্রধান স্থল পরিবহণ মাধ্যম এবং ঐতিহ্যগতভাবে স্থল পরিবহনের ক্ষেত্রে এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে এখনও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ইহা দেশের প্রধান প্রধান শহর, বন্দর, বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রের সঙ্গে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ সাধন করছে। ফলে নূতন শিল্প স্থাপন, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে রেলপথের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে, বর্তমানে সড়ক পথের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিবহনের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন।

বর্তমানে বাংলাদেশে রেল পথের পরিমান ২,৭০৬ কি.মি।

বাংলাদেশের রেলপথের বিবরণ (Description of Bangladesh Railways)

বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমান রেলপথ আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম রেলপথের সূচনা হয় ১৮৬২ সালের ১৫ই নভেম্বর। দর্শনা হতে জগতী পর্যন্ত ৫৩ কি.মি.। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় অবিভক্ত ভারতে ৯টি প্রধান রেলপথ ছিল। বাংলাদেশে উহার একটি আংশিকভাবে লাভ করে। ঐ সময় বাংলাদেশ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২৭০৬ কি.মি. যা আসাম বেঙ্গল রেলপথের অংশ বিশেষ ছিল। এর মধ্যে ব্রডগেজ ৮৭৫ কি.মি., মিটারগেজ ১৮০০ কি.মি. এবং ন্যারোগেজ ৩১ কি. মি. রেলপথ ছিল। ১৯৭২-৭৩ সালে দেশে মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২,৮৭৪.৩ কি.মি., যা ১৯৭৯-৮০ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২,৮৮৩.৯ কি.মি. হলেও তা ১৯৮২-৮৩ সালে হ্রাস পেয়ে ২,৮৬৬.১ কি. মিঃ হয়। পরবর্তীতে এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ক্রমান্বয়ে আরও হ্রাস পেয়ে ১৯৯২-৯৩ সালে ২,৭০৬ কি.মি. হয়েছে, যা এখনও অপরিবর্তিত আছে। এর মধ্যে ব্রডগেজ ৮৮৪ কি.মি. ও মিটারগেজ ১,৮২২ কি.মি.।

বাংলাদেশে রেল পথের সূচনা হয় ১৮৬২ সালে।

সারণী ১৮.৩.৩ ঃ বাংলাদেশে রেলপথের পরিমাণ (কি.মি. হিসাবে)

বছর	ব্রডগেজ	মিটারগেজ	মোট
১৯৯১-৯২	৯২৪	১৮২২	২৭৪৬
১৯৯২-৯৩	৮৮৪	১৮২২	২৭০৬
১৯৯৩-৯৪	৮৮৪	১৯২২	২৭০৬
১৯৯৪-৯৫	৮৮৪	১৮২২	২৭০৬
১৯৯৫-৯৬	৮৮৪	১৮২২	২৭০৬
১৯৯৬-৯৭	৮৮৪	১৮২২	২৭০৬

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৮

বাংলাদেশ রেলওয়ের বর্তমানে স্টেশন সংখ্যা ৪৮৯টি (১৯৯৫-৯৬) এবং এর মধ্যে ব্রডগেজ ১৫২টি এবং মিটারগেজে ৩৩৭টি। ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৩-৯৪ বছরে মোট স্টেশন এবং তাদের শ্রেণী বিভাগ, ১৯৯৫-৯৬ এর অনুরূপ ছিল। ১৯৯২-৯৩ বছরে মোট স্টেশন সংখ্যা ৪৯০টি; এর মধ্যে ব্রডগেজে ১৫২টি এবং মিটারগেজে ৩৩৮টি। নীচের সারণীতে বাংলাদেশ রেলওয়ের রেল ইঞ্জিন ও গাড়ীর পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে।

সারণী ১৮.৩.৪ ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের রেল ইঞ্জিন ও গাড়ীর সংখ্যা

বছর	ইঞ্জিন			গাড়ীর সংখ্যা		
	বাষ্প	ডিজেল	মোট	যাত্রী	অন্যান্য কোচ	ওয়াগণ
১৯৯১-৯২		৩০৭	৩০৭	১৪৩০	১৮৪	১৫১৬২
১৯৯২-৯৩	-	২৮৭	২৮৭	১৩৭২	১৭২	১৪৭০৬
১৯৯৩-৯৪	-	২৭৫	২৭৫	১৩৫৯	১৫২	১৪৫৪৫
১৯৯৪-৯৫	-	২৭৯	২৭৯	১৩২৩	১৫৫	১৪৩৬৭
১৯৯৫-৯৬	-	২৭২	২৭২	১২৭৭	১৫৩	১৩৮১৭
১৯৯৬-৯৭	-	২৮৪	২৮৪	১২৪৫	১৫২	১২৯৪৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৮

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রেলপথ সমূহ (Main Railways of Bangladesh)

রেলপথের উন্নয়ন কার্যক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের রেলপথকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। যেমন -
(ক) বৃটিশ আমলের রেলপথ,
(খ) পাকিস্তান আমলের রেলপথ ও
(গ) বাংলাদেশ আমলের রেলপথ।

বর্তমানে বাংলাদেশে ব্রডগেজ ও মিটারগেজ রেলপথ রয়েছে। ব্রডগেজ রেলপথ যুমনা নদীর পশ্চিমাংশে অর্থাৎ খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের কিছু অংশ এবং মিটারগেজ রেলপথ যমুনা নদীর পূর্বাংশে অর্থাৎ ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ ও রাজশাহী বিভাগের কিছু অংশ।

ক. মিটারগেজ রেলপথ ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে (১৯৯৬) ১৮২২ কিঃ মিঃ মিটারগেজ রেলপথ আছে এবং ইহার অধিকাংশই ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত। এ প্রকার রেলপথের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেলপথ হলোঃ

১. চট্টগ্রাম - লাকসাম - আখাউড়া - ভৈরববাজার - নরসিংদী - টঙ্গী - ঢাকা - নারায়নগঞ্জ রেলপথ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রেলপথ।
২. আখাউড়া-শায়েস্তাগঞ্জ-কুলাউড়া-সিলেট-ছাতক রেলপথ।
৩. নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-টঙ্গী-ময়মনসিংহ-জামালপুর রেলপথ।
৪. জামালপুর-দেওয়ানগঞ্জ - বাহাদুরাবাদ ঘাট রেলপথ।
৫. জামালপুর - সরিষাবাড়ী - জগন্নাথগঞ্জ রেলপথ।
৬. লাকসাম - চৌমুহনী - নোয়াখালী - সোনাপুর রেলপথ।
৭. ভৈরব বাজার - গৌরীপুর - ময়মনসিংহ রেলপথ।
৮. গৌরীপুর - নেত্রকোনা - মোহনগঞ্জ রেলপথ।
৯. চট্টগ্রাম - দোহাজারী এবং চট্টগ্রাম - হাটহাজারী - নাজির হাট - ফটিকছড়ি রেলপথ।
১০. শান্তাহার - ফুলছড়ি - লালমনির হাট - হাতীবান্দ্বা রেলপথ।
১১. বোনারপাড়া - বগুড়া - শান্তাহার রেলপথ।
১২. ফুলছড়ি ঘাট - বোনারপাড়া - কাউনিয়া - রম্পুর - পাবর্তীপুর - দিনাজপুর রেলপথ।

খ. ব্রডগেজ রেলপথ ঃ বাংলাদেশে বর্তমানে (১৯৯৬) ৮৮৪ কি ঃ মিঃ ব্রডগেজ রেলপথ আছে। এই প্রকারের রেলপথ খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত। তবে ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলায় সামান্য ব্রডগেজ রেলপথ আছে। নিম্নে ব্রডগেজ রেলপথের প্রধান পথগুলি দেখানো হলো ঃ

১. খুলনা - যশোহর - দর্শনা - চুয়াডাঙ্গা - পোড়াদহ - ঈশ্বরদী - শান্তাহার - পার্বতীপুর - সৈয়দপুর - চিলহাটি রেলপথ বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলপথ।
২. ঈশ্বরদী - আব্দুলপুর - রাজশাহী - আমনূরা - চাঁপাই নবাবগঞ্জ রেলপথ।
৩. পোড়াদহ - কুষ্টিয়া - রাজবাড়ী - গোয়ালন্দ রেলপথ।
৪. রাজবাড়ী - ফরিদপুর রেলপথ।

৫. যশোহর - বেনাপোল রেলপথ।

৬. পার্বতীপুর - জয়পুরহাট - শান্তাহার - নাটোর রেলপথ।

বাংলাদেশ রেলপথে বাহিত যাত্রী ও মালের পরিমাণ

১৯৭২-৭৩ সালে রেলপথে মোট যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমান ছিল যথাক্রমে ২৭৯.৯৮ কোটি প্যাসেঞ্জার কিঃ মিঃ ও ৬৬.৭৩ কোটি টন কিলোমিটার, যা ১৯৮৪-৮৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬০৩.১৩ কোটি প্যাসেঞ্জার কিঃ মিঃ ও ৮১.২৯ কোটি টন কিঃ মিঃ হয়। পরবর্তীতে ১৯৯০-৯১ সালে রেলপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমান যথাক্রমে ৪৫৮.৬৮ কোটি প্যাসেঞ্জার কিঃ মিঃ ও ৬৫.১০ কোটি টন কিঃ মিঃ হয়। পণ্য পরিবহণ পরবর্তীতে কিছুটা বৃদ্ধি পেলে ও যাত্রী পরিবহণ ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৯৬-৯৭ সালে যাত্রী হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩৭৫.৪ কোটি প্যাসেঞ্জার কিঃ মিঃ। পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি পায় ৭৮.২৫ কোটি টন কিঃ মিঃ। ১৯৯৭-৯৮ সালে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ যথাক্রমে ৩৯৮.৯ কোটি প্যাসেঞ্জার কিঃ মিঃ ও ৭৬.৫ কোটি টন কিঃ মিঃ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১৯৯৭-৯৮ সালের রাজস্ব আয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৭০.০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে খুচরা যন্ত্রাংশ ও তেলের মূল্য বৃদ্ধিসহ অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধির কারণে রাজস্ব ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০৬.২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের রেলপথে সাধারণতঃ কন্টেইনার, পাট, পাটজাতদ্রব, ধান, চাউল, গম, চা, চামড়া, সিমেন্ট, চিনি, লবণ, কয়লা ইত্যাদি পরিবাহিত হয়ে থাকে।

সারণী ১৮.৩.৫ ঃ রেলপথে বিভিন্ন পণ্যের পরিবাহিত হার

পণ্য	১৯৯০-৯১ (%)	১৯৯১-৯২ (%)	১৯৯২-৯৩ (%)	১৯৯২-৯৩ (%)	১৯৯৩-৯৪ (%)	১৯৯৪-৯৪ (%)
গম	২২.৬৫	২৩.৬৬	১২.৬৪	১৩.৫৩	১৫.২৫	১৭.৮৮
পাট পাটজাত দব্য	০.২২	০.৪৮	০.৪৯	০.৩৩	০.৪৪	০.৩৯
ধান ও চাউল	১৪.৩১	১৭.০৪	১২.১৩	৯.৮৫	৯.৯৩	১১.৩৩
চিনি	০.৬৮	০.৭৬	০.৬৫	০.৪৩	০.২৬	০.২৭
লবণ	২.৩০	২.২৭	২.০৬	০.৪৬	০.১১	০.০৩
কয়লা	২.৯৪	২.৫১	৫.৯৪	৩.৬১	২.৯০	১.৪১
সিমেন্ট	৪.৫৩	৪.৩১	১৩.৮৩	১৭.৯৩	১৩.৪১	৯.১৭
পেট্রোল	০.২৩	০.১৬	০.১২	০.১৭	০.১৮	০.৩১

Source : Statistical Yearbook of Bangladesh, 1997.

বাংলাদেশের রেল পথকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

বাংলাদেশের রেলপথের গুরুত্ব (Importance of Railways of Bangladesh)

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিবহনের মাধ্যম হিসাবে রেল পরিবহনের গুরত্ব অপরিসীম। নিম্নে বাংলাদেশ রেল পরিবহনের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো ঃ

১. **পণ্য পরিবহণ ঃ** পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ রেলপথ দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহর, বন্দর, শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় কৃষি দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য এক স্থান হতে অন্যস্থানে অতি সহজে রেলের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। এ ছাড়াও দেশের বৃহত্তম বন্দরের সঙ্গে রেল পথের সংযোগ থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থান হতে রপ্তানিযোগ্য পণ্য সামগ্রী বন্দরে পৌঁছানো সুবিধা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতি বছর বাংলাদেশ রেলপথের মাধ্যমে প্রায় ২৬ লক্ষ টন পণ্যদ্রব্য পরিবাহিত হয়।

২. **যাত্রী পরিবহণ ঃ** যাত্রী পরিবহনে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী রেলপথের মাধ্যমে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় যাতায়াত করে থাকে। অবশ্য এ পথে শ্রেণী ভিত্তিতে লোকজন যাতায়াত করে। এ পথে

শ্রেণীভিত্তিতে বসবার আসন বরাদ্দ করা থাকে। শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত কামরা, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরা প্রভৃতির ভাড়া নির্ধারণ করা থাকে। এ পথে প্রতি বছর প্রায় ১১ কোটি যাত্রী যাতায়াত করে।

৩. **কৃষি উপকরণ ঃ** কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। এ পথে কৃষি উপকরণ সমূহ বিশেষ করে বীজ, সার, কীটনাশক, ঔষধ, ট্রাক্টর, পানি সেচ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে পরিবাহিত হয়। আবার গ্রামাঞ্চল হতে কৃষিজাত পণ্য শহর ও বন্দরের বাজারে এ পথের মাধ্যমে পাঠান সম্ভব হয়। ইহাকে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়। ফলে কৃষির উন্নয়ন সাধন ঘটে।

৪. **শিল্পোন্নয়ন ঃ** দেশের শিল্পোন্নয়নে রেলপথ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ পথের সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে শিল্পের কাঁচামাল শিল্পকেন্দ্রে আনয়ন করা যায়। আবার শিল্প কেন্দ্র হতে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য দেশের বিভিন্ন অংশে রেলপথের মাধ্যমে পৌঁছানো হয়। ফলে দ্রুত শিল্পের উন্নয়ন ঘটে।

৫. **বাজারের বিস্তৃতি ঃ** বাজারের বিস্তৃতি ঘটাতে রেলপথের গুরুত্ব যথেষ্ট। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার প্রসারে এ পথ সাহায্য করে। কারণ এপথে দেশের বড় বড় বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রয়েছে।

৬. **শ্রমের গতিশীলতা ঃ** রেলপথে দেশে শ্রমের গতি শীলতা বৃদ্ধি করে। এ পথে খুব সূলভে একস্থান হতে অন্য স্থানে শ্রমিকেরা কাজের সন্ধানে যাতায়াত করতে পারে। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমিক পেতে অসুবিধা হয় না। আবার শ্রমিকদের ও কর্ম নিয়োগের পথ বৃদ্ধি পায়।

৭. **দ্রব্যমূল্যের সমতা ঃ** দেশের মধ্যে দ্রব্যমূল্যের সমতা রক্ষার্থে রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। রেলপথের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্য অল্প খরচে বিতরণ করা যায়। ফলে কোথাও পণ্যের অভাব থাকে না পণ্যের দাম স্থিতিশীল থাকে।

৮. **শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ ঃ** রেলপথ শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে ও সাহায্য করে। এ পথের মাধ্যমে শহর ও গ্রামের পণ্য বিনিময়ের সাথে সাথে শহর ও গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটে।

৯. **রাজস্ব আদায় ঃ** রেলপথ এ দেশের রাজস্ব আদায়ের অন্যতম প্রধান উৎস। এ খাত হতে সরকার প্রচুর রাজস্ব আদায় করে থাকে।

১০. **কর্মসংস্থান ঃ** রেলপথে অসংখ্য শ্রমিক ও কর্মকর্তা নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অর্থাৎ রেলপথ কর্মসংস্থানের জন্য একটি উত্তম মাধ্যম।

১১. **জরুরী অবস্থার মোকাবেলা ঃ** এ ক্ষেত্রে রেলপথের অবদান অবর্ণনীয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস প্রভৃতি দূর্যোগের সময় রেলপথের মাধ্যমে ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করা যায়। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

১২. **আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ঃ** এ ক্ষেত্রেও রেল পথের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক সময় দেশের মধ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। সেই সময় রেলপথের মাধ্যমে সামরিক, আধাসামরিক ও পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করা যায়।

অতএব, উপরের আলোচনা হতে বলা যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিবহণ মাধ্যম হিসাবে রেলপথের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠ সংক্ষেপ

রেল পথ বাংলাদেশের পরিবহণ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে রেল পথের পরিমাণ ছিল ২,৭০৬ কি.মি.। স্বাধীনতার পরে রেল পথের পরিমাণ বাড়লেও বর্তমানে রেল পথের পরিমাণ পূর্বের অনুরূপ অর্থাৎ ২,৭০৬ কি.মি.। এ ক্ষেত্রে সরকারের আশু গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিনঃ

১। বাংলাদেশের সড়ক পরিবহণ (যান্ত্রিক) -- ।

ক) শতকরা ৬৬ ভাগ পণ্য এবং শতকরা ৭৩ ভাগ যাত্রী বহন করে

খ) শতকরা ৭৩ ভাগ পণ্য এবং শতকরা ৬৬ ভাগ যাত্রী বহন করে

গ) শতকরা ৫৫ ভাগ পণ্য এবং শতকরা ৭৭ ভাগ যাত্রী বহন করে

২। বাংলাদেশের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে কত কি.মি. সড়ক রয়েছে ?

ক) ২৫ হাজার কি.মি.-র অধিক খ) ২০ হাজার কি.মি.-র অধিক গ) ১৫ হাজার কি.মি.-র অধিক

৩। বাংলাদেশে বর্তমানে জাতীয় জনপথের পরিমান কত?

ক) ৩০৬৩ কি. মি. খ) ৩১৬৩ কি. মি. গ) ৩২৬৩ কি. মি.

৪। বাংলাদেশের পৌরসভা সড়ক পথের পরিমান কত কি.মি.?

ক) ৬২০০ কি. মি. খ) ৬৮০০ কি. মি. গ) ৬৫০০ কি. মি.

৫। ইউনিয়ন পরিষদ সড়ক পথের কত ভাগ কাঁচা?

ক) ৮০ ভাগ খ) ৯৯ ভাগ গ) ৮২ ভাগ

৬। ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের পরে কত কি.মি. রেলপথ ছিল?

ক) ২৬০৬ কি. মি. খ) ২৭০৬ কি. মি. গ) ২৮০৬ কি. মি.

৭। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম রেল পথের সূচনা হয় -- ।

ক) ১৮৬২ সালের ১৫ই নভেম্বর খ)১৯৬২ সালের ১৫ই নভেম্বর গ) ১৯৬২ সালের ১৪ই নভেম্বর।

৮। বাংলাদেশে প্রথম রেলরুট কোনটি?

ক) দর্শনা থেকে চুয়াডাঙ্গা খ) দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া গ) দর্শনা থেকে জগতী

৯। বাংলাদেশে ব্রডগেজ রেলপথের পরিমান কত কি. মি.?

ক) ৬৮৪ কি. মি. খ) ৮৮৪ কি. মি. গ) ৭৮৪ কি. মি.

১০। বাংলাদেশ রেলওয়ের বর্তমান স্টেশনের সংখ্যা কতটি?

ক) ৪৮৯টি খ) ৩৮৯টি গ) ৪৯০টি

১১। রেলপথের উন্নয়ন কার্যক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের রেলপথকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সড়ক পথের শ্রেণী বিভাগ করুন।

২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়ক পথের গুরুত্ব কি?

৩. উন্নয়নের কার্যক্রম অনুযায়ী রেল পথকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

৪. রেলপথকে সাধারনতঃ কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

৫. বাংলাদেশে রেল পথের গুরত্ব কি কি?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সড়ক পথের বিবরণ দিন।

২. বাংলাদেশের রেলপথের বিবরণ দিন।

পাঠ-১৮.৪ ঃ বিমানপথ এবং এর গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ বাংলাদেশের বিমান পথ সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ☞ বাংলাদেশের বিমান পথের গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- ☞ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে পরিবহন ব্যবস্থার প্রভাব বলতে পারবেন।

বর্তমান সভ্যতার অগ্রগতিতে বিমান পরিবহণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বিমান পথ ও বিমান সার্ভিসের কিভাবে উন্নতি হয়েছে ? বিমান পথ, বিমান বন্দর সর্বোপরি বিমান পরিবহণের গুরুত্ব আমরা এ পাঠ থেকে জানার চেষ্টা করবো।

বাংলাদেশের বিমান পথ (Airways of Bangladesh)

১৯৭২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী 'বাংলাদেশ বিমান' গঠিত হয়।

বিমানপথ বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। আধুনিক যুগে পরিবহণের গুরুত্ব অপরিসীম। দ্রুত যাত্রী ও পণ্য চলাচলের জন্য বিমানই সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বন্দরগুলির মধ্যে দ্রুত পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান পরিবহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ জন্য দেশের বিমানপথকে দেশের অন্যান্য পরিবহণের চেয়ে কোনক্রমেই ছোট করে দেখা যায় না।

বাংলাদেশ বিমানের ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical Background of Bangladesh Biman)

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পাক-ভারত ও বাংলাদেশ উপমহাদেশ সর্বপ্রথম আকাশপথ ব্যবহার করে। ১৯২০ সালে বঙ্গ-ভারতে প্রথম বিমানপথে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৬ সালে প্রথম বেসামরিক বিমান দ্বারা অবিভক্ত ভারতবর্ষে ডাক চলাচল শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানে ''ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজ লিমিটেড'' এর একটি মাত্র বিমান কলিকাতা-আকিয়াব ও রেঙ্গুনের মধ্যে যাতায়াত করতো। এই সময়ে ''পাক ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজ লিমিটেড'' এবং ''ক্রিসেন্ট এয়ার ট্রান্সপোর্ট'' নামে দুটি বিমান কোম্পানী ছিল। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স করপোরেশন নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। সংক্ষেপে ইহা পি.আই.এ নামে পরিচিত ছিল। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে মাত্র তিনখানা বিমান নিয়ে এ কোম্পানীর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে কোম্পানি স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা হিসাবে গঠিত হয়। এ সময় ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজ পি.আই.এ (PIA) এর সঙ্গে মিলে যায় এবং ক্রিসেন্ট এয়ার ট্রান্সপোর্ট উঠে যায়। কাজেই ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স করপোরেশন (PIA) একমাত্র বিমান সংস্থা ছিল।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ বিশ্ব-মানচিত্রে স্থান করে নেয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ হতে পি.আই.এ (PIA) নামটি বাদ দিয়ে ১৯৭২ সালের ৪ঠা জানুযারী বাংলাদেশ সরকার এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যম 'বাংলাদেশ বিমান' নামে একটি বিমান সংস্থা স্থাপন করেন। পাকিস্তান হতে বাংলাদেশ কোন বিমান না পাওয়ায় প্রথম অবস্থায় বিভিন্ন চলবার মতো কোন বিমান ছিল না। প্রথমে ভারতের দেওয়া একটি 'ডাকোটা' বিমান দ্বারা বাংলাদেশ বিমানের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু উক্ত বছরের ১০ই ফেব্রুয়ারীতে এক দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে উহা বিধবস্ত হয়। ফলে বেশ কিছু দিন বাংলাদেশে বিমান চলাচল বন্ধ থাকে। ইহার পর পুনরায় ভারত হতে ২টি ফকার ফ্রেন্ডশীপ-২৭ বিমান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ বিমান তার কার্যক্রম শুরু করে। এ সময় ঢাকা চট্রগ্রাম এবং ঢাকা-যশোরের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ২৮ শে এপ্রিল হতে ঢাকা ও কলিকাতার মধ্যে আঞ্চলিক ফ্লাইট চালু হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ আর ও ২টি বিমান ইংল্যান্ড হতে সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে হল্যান্ডের ৬০০ মার্কের আরও দুটি এফ-২৭ বিমান সংগ্রহ করে এবং অস্টেথলিয়া সরকারের দান হিসাবে আরও দুটি ২০০ মার্কের এফ-২৭ লাভ করে।

বাংলাদেশ বিমান আকাশ পথে পরিবহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বহরে ৪টি ডিসি ১০-৩০, ২টি এ ৩১০-৩০০ এয়ার বাস, ১টি এফ-২৮ এবং ২টি এটিপি উড়োজাহাজ রয়েছে। একটি এফ-২৮ উড়োজাহাজ ৬ মাসের জন্য লীজে নেয়া হয়েছে। বিমান ফ্লাইটের পূর্নবিন্যাস ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমানে গঠিত ফ্লাই প-ানিং কাজ চলছে।

বাংলাদেশ বিমানের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে কি জানেন?

বাংলাদেশের বিমান সার্ভিসে পরিবাহিত যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ

বাংলাদেশে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিমান সার্ভিস চালু রয়েছে। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহুসংখ্যক যাত্রী ও পণ্য প্রতি বৎসর পরিবাহিত হয়ে থাকে। নিম্নের সারণীতে বাংলাদেশ বিমানের কার্যক্রম সংক্রান্ত নির্দেশকগুলি দেখানো হয়েছে।

সারণী ১৮.৫.১ ঃ বাংলাদেশ বিমানের কার্যক্রম সংক্রান্ত নির্দেশকগুলি

তালিকা	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬
পরিবাহিত যাত্রীঃ (০০০ জন)					
আভ্যন্তরীণ	৪১৪	৪১৭	৪৩১	৪৫২	৪৫১
আন্তর্জাতিক	৬৭৫	৬৫৬	৭২২	৭৯৯	৮১০
মোট	১০৮৯	১০৭৩	১১৫৩	১২৫১	১২৬১
পরিবাহিত পণ্য ও ডাক (মিলিয়ন পাউন্ড)	৫৫	৫৫	৫৯	৭৩	৭০
পণ্য টন কিলোমিটার (মিলিয়ন)	১১১	১১৩	১২১	১৩৭	১৩৯
কর্মরতদের সংখ্যা	৫২৪০	৫২৯৫	৫৬১৩	৫৮৯৩	৫৯৩৬

Source : Statistical Yearbook of Bangladesh. 1997.

বাংলাদেশ বিমানের বিগত ৬ বছরের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিসংখ্যান নীচের সারণীতে ১৮.৫.২ দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ বিমান ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে ১২.৬৪ লক্ষ যাত্রী এবং ৩২,৪৭০ টন পণ্য পরিবহণ করে। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরের তুলনায় ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের যাত্রী পরিবহণ ০.৪৮ এবং পণ্য পরিবহণ ০.৮৬% বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরের তুলনায় ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের যাত্রী পরিবহণ ৭.৫% বৃদ্ধি পায় তবে পণ্য পরিবহণ ৫% হ্রাস পায়। ১৯৯৭-৯৮ সালের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) বিমানের যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমান যথাক্রমে ৬.৫৭ লক্ষ ও ১৬.৫৬৪ টন।

সারণী ১৮.৫.২ ঃ ১৯৯২-৯৩ হতে বাংলাদেশ বিমানে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিসংখ্যান

সেক্টর		১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮ (জুলাই-ডিসেম্বর
যাত্রী পরিবহন	আভ্যন্তরীণ	৪১৯৭৫৫	৪৩১৩৩৫	৪৫৩৪০৩	৪৬২০১৫	৫০০০১০	২৩৪৬৭৬
	আঞ্চলিক	১৪৪৩২৯	১৫৯৫৩৫	১৬৫৪৩৮	১৭৯৩৮৯	১৯৩৮৯৩	৯৫৫৬৬
	আন্তর্জাতিক	৫২০৮৮৭	৫৬২৭৬৭	৬৩৯৬৬৯	৬২৩০৯৭	৬৬৫০০৪	৩২৬৮০৯
	মোট	১০৮৪৯৭১	১১৫৩৬৩৭	১২৫৮৫১০	১২৬৪৫০১	১৩৫৮৯০৭	৬৫৭০৫১
পণ্য পরিবহণ (টন)	আভ্যন্তরীণ	১৫১৫	১১৭৪	৮৮২	৭৩২	৭৫০	৩০৭
	আঞ্চলিক	৫০২	৫৩৩	৩৩৭	৩২৩	৩০৮	৪৬১
	আন্তর্জাতিক	২১৮৩৬	২৪৫০৩	৩০৯৭৪	৩১৪১৫	২৯৭৮২	১৫৭৯৬
	মোট	২৩৮৫৩	২৬২১০	৩২১৯৩	৩২৪৭০	৩০৮৪০	১৬৫৬৪
ডাক পরিবহণ	আভ্যন্তরীণ	১২৮	১৩২	১৩০	১০৭	১০১	৪৯
	আঞ্চলিক	১৭	৩৬	৪০	৩৮	২৯	১৬
	আন্তর্জাতিক	২২	১৯৬	৩৭৩	২৫৭	১৮০	১০৩
	মোট	৩৬৭	৩৬৪	৫৪৩	৪০২	৩১০	১৬৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৮

অপরদিকে আর্থিক অগ্রগতি (১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স ক্রমাগতভাবে মুনাফা অর্জন করছে (১৮.৫.৩)। তবে তার হার ক্রমাগত হ্রাস পায়। রাজস্ব আয়ের তুলনায় রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মুনাফা হ্রাস পায়।

সারণী ১৮.৫.৩ ঃ ১৯৯১-৯২ হতে বাংলাদেশ বিমান এয়ার লাইন্সের আয়/ব্যয় এর অগ্রগতি (বাংলাদেশ বিমান থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে)।

(লক্ষ টাকায়)

বছর	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬
রাজস্ব আয়	৭৮,৮৯৯.৪৯	৮৮০৫৩.০৪	৯৬৮০০	১০৬৮১৮.৩৫	১০৭৬৪৮.৯৭
রাজস্ব ব্যয়	৭৫৪২২.১১	৮১২৬১.৭৯	৯০৫০৪.৮২	১০০৭০৩.১৭	১০৫৪১১.৬৫
নীট মুনাফা	৩৪৭৭.৩৮	৬৭৯১.২৫	৬৩৯৪.৭২	৬১১৫.১৮	২২৩৭.৩২

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ১৯৯৮।

বাংলাদেশ বিমান সার্ভিস/পথ (Air Service of Bangladesh)

বাংলাদেশের বিমান সার্ভিসকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা

(ক) অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস ও (খ) আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস।

(ক) অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস ঃ দেশের ভিতরে বিভিন্ন জেলায় বিমান চলাচল করার নামই হলো অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস। নিম্নলিখিত অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান যাতায়াত করে। যেমন -

১। ঢাকা - চট্টগ্রাম
২। ঢাকা - যশোর
৩। ঢাকা - সিলেট
৪। ঢকা - ঈশ্বরদী
৫। চট্টগ্রাম -যশোহর
৬। চট্টগ্রাম - কক্সবাজার
৭। ঢাকা - কক্সবাজর
৮। ঢাকা - সৈয়দপুর
৯। ঢাকা - রাজশাহী
১০। কক্সবাজর - ঢাকা
১১। ঢাকা - বরিশাল।

(খ) আন্তর্জাতিক বিমান পথ ঃ বাংলাদেশ বিমান যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলাচল করে তখন তাকে বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক সার্ভিস বলা হয়। বাংলাদেশ বিমান বর্তমানে নিম্নলিখিত ২৫টি আন্তর্জাতিক রুটে চলাচল করে ঃ

১। ঢাকা - কলিকাতা
২। চট্টগ্রাম - কলিকাতা
৩। ঢাকা - কাঠমুন্ডু
৪। ঢাকা - লন্ডন
৫। ঢাকা -দুবাই
৬। ঢাকা - ব্যাংকক
৭। ঢাকা - করাচী
৮। ঢাকা - আবুধাবী
৯। ঢাকা - বোম্বাই
১০। ঢাকা - সিঙ্গাপুর
১১। ঢাকা - জেদ্দা
১২। ঢাকা - দোহা
১৪। ঢাকা - কুয়েত
১৫। ঢাকা - এথেন্স
১৬। ঢাকা -ত্রিপলী
১৭। ঢাকা - মাসকাট
১৮। ঢাকা - কুয়ালালামপুর
১৯। ঢাকা - ইস্তাম্বুল
২০। ঢাকা - রেঙ্গুন
২১। ঢাকা - রোম
২২। ঢাকা - বাগদাদ
২৩। ঢাকা - টোকিও
২৪। ঢাকা - জাকার্তা
২৫। ঢাকা - প্যারিস।

১৩। ঢাকা - আমস্টারডাম

অদূর ভবিষ্যতে কলম্বো, মালে, সিউল, ম্যানিলা, বেইজিং, কায়রো, বৈরুত, তেহরান, ম্যানচেস্টার টরেন্টো, মেলবোর্ন, সিডনিতে বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

বাংলাদেশের বিমান সার্ভিসকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

বাংলাদেশের বিমানবন্দর সমূহ (Airports of Bangladesh)

বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪টি অপারেশনাল বিমান বন্দর রয়েছে। এর মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক, ৬টি অভ্যন্তরীণ ও ৫টি ষ্টলপোর্ট।

বাংলাদেশে ১৪টি বিমান বন্দর আছে।

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গুলো হল কুর্মিটোলার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম বিমান বন্দর ও সিলেটের ওসমানী বিমান বন্দর। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দেশের সর্ববৃহৎ বিমান বন্দর। ৬টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর হলো যশোহর, ঈশ্বরদী, কক্সবাজার, সৈয়দপুর, রাজশাহী, বরিশাল।

২টি নূতন স্টলপোর্ট নির্মানাধীন আছে। এ্যারো বেঙ্গল নামের একটি বেসরকারী এয়ার লাইন্স ঢাকা-বরিশাল রুটসহ অন্যান্য রুটে স্টল সার্ভিস পরিচালনা করছে। ১৯৯৭ সালের শেষে এয়ার পারাবাত ও ১৯৯৮ সালের প্রথম দিকে জিএমজি নামের দুইটি বেসরকারী এয়ার লাইন্স ষ্টল সার্ভিস চালু করেছে এবং আরো বেসরকারী এয়ার লাইন্স ষ্টল সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। বগুড়াতে একটি বিমান বন্দর স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জঅতিক বিমান বন্দর সমূহ কি কি?

বিমান পথের গুরুত্ব (Importance of Airways)

বিমানপথ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিমান পথের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ। নিম্নে বিমান পরিবহনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

১. লঘু ও ভঙ্গুর পণ্য সম্ভার একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিবাহিত করার জন্য বিমান পরিবহণ অবদান রাখে।
২. বিমান পরিবহণ অত্যন্ত দ্রুতগামী পরিবহণ বলে পচনশীল দ্রব্যাদি বহনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উপযোগী।
৩. বিমান পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও নদ-নদীর উপর দিয়ে সোজাসুজি চলতে পারে বলে কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়।
৪. বিমান পরিবহনের জন্য কোন পথ নির্মাণ করতে হয় না। অথচ অন্যান্য পরিবহনের জন্য পথ নির্মাণ করতে হয়।
৫. দেশের কৃষি উন্নয়নেও এ পথের গুরুত্ব ব্যাপক। কারণ অনেক সময় দেখা যায় - বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে পঙ্গপালের আক্রমণ ব্যাপকভাবে দেখা হয়। সে সময় পঙ্গপালের আক্রমণের হাত হতে কৃষি ফসলকে রক্ষা করার জন্য বিমানযোগে শস্যক্ষেত্রে কীটনাশক ঔষধ স্প্রে করা হয়।
৬. ভ্রমণের ক্ষেত্রে এ পথের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবহণ ব্যবস্থায মধ্যে বিমানপথই হলো সবচাইতে সহজ ও আরামদায়ক।
৭. বিমানযোগে দেশের অনেক দূর্গম অঞ্চলেও যাতায়াত করা যায়।
৮. দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি শ্রঙ্খলার ক্ষেত্রেও এ পথের গুরুত্ব অপরিসীম।
৯. দেশকে বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করার জন্য এ পথের অবদানও কম নহে।
১০. জরুরী অবস্থায় রাষ্টৈথর নিরাপত্তা ও শান্তি শৃঙ্খলার দিক হতেও বিমান পথের অবদান যথেষ্ট রয়েছে।
১১. দুর্ভিক্ষ, বন্যা, জলোচ্ছাস প্রভৃতি জাতীয় দূর্যোগের সময় বিমান পরিবহনের গুরুত্ব অপরিসীম।
১২. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রেও এ পরিবহনের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।
১৩. পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য দেশের হজ্জ যাত্রীদের পরিবহনের ক্ষেত্রেও বিমান পরিবহনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

সুতরাং উপরের আলোচনা হতে বলা যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিমান পথের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠ সংক্ষেপ

দ্রুত পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে বিমান পথই সর্বোৎকৃষ্ট। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ বিমান এর অবস্থা দূর্বল থাকলেও বর্তমানে বিমান বহরে ৪টি ডিসি১০-৩০, ২টি ৩১০ ও ৩০০ এয়ার বাস, ১টি এফ-১৮ এবং ২টি এটিপি উড়োজাহাজ রয়েছে।

পাঠ-৬ ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব

কোন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। তাই বলা হয় আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এ দুটি বিষয় অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, উৎপাদনের উপকরণের গতিশীলতা বজায় রাখা এবং দেশব্যাপী স্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য বজায় রাখতে দক্ষ ও সুসংগঠিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অবদান অপরিসীম। বিশেষ করে বর্তমান ভূমন্ডলীয় বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপটে এবং দেশে অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে সাথে এক উন্নত আভ্যন্তরীণ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। আর সঙ্গত কারণেই বিশ্বে এমন কোন দেশ নেই যে, তার পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই ইংরেজীতে একটি কথা আছে - 'Transport is Civilization' অর্থাৎ 'পরিবহণই হলো সভ্যতা'।

'পরিবহণই হলো সভ্যতা'

অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অনুন্নত ও উন্নয়ন শীল দেশ। তাই এদেশের ও আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীন যুগেও এদেশে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত ছিল। ইংরেজ রাজত্বের সেই সময়ে এদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যতটুকু উন্নতি হযেছিল তা শুধুমাত্র তাদের নিজেদের সযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য। এদেশের সামগ্রিক উন্নতির সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে তখন কোন পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। তারপর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান (পূর্ব পাকিস্তান) হিসেবে এ দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার ও এদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দিকে ততটা নজর দেয়নি। বিভিন্ন রকমের কারণ দেখিয়ে পাকিস্তান সরকার পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকে এড়িয়ে গেছে। তবে ১৯৬০ সালের পর হতে আইউব খান সরকার এদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে বেশ দৃষ্টি দেয় এবং সে সময় হতেই এদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন ঘটেছে। স্বাধীনতার পর আশির দশকে তৎকালীন সরকার কর্তৃক উপজেলা শাসন ব্যবস্থা চালু হবার পর দেশের জেলা শহরের সাথে উপজেলার সংযোগ স্থাপনের জন্য যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বেশ উন্নতি সাধিত হয়। বর্তমান সরকারের সময়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু এদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নতির দ্বার উন্মোচন করেছে। এ সেতু দেশের উত্তর-পশ্চিাঞ্চলকে পূর্বাঞ্চলের সাথে সংযোগ সাধান ছাড়া ও এদেশের উত্তরাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে এবং দেশের ভারসাম্য অর্থনীতি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশের উন্নতি অর্থাৎ এর শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। এজন্য এখাতে আরো বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং একই সাথে ব্যবস্থাপনার উন্নতির দিকে আরো নজর দেয়া জরুরী।

পাঠ সংক্ষেপ

পরিবহণ ক্ষেত্রে আরোও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং আরোও উন্নত করতে হবে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনে উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। স্বাধীনতা পরিবর্তীতে পরিবহণ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও এক্ষেত্রে আরো উন্নতি আশু প্রয়োজন। একইভাবে বলা যায় যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.৪

সঠিক উত্তরের গায়ে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উন্নত .....।
(ক) পরিবহণ যোগাযোগ ব্যবস্থা (খ) রাষ্টথীয় স্বাধীনতা (গ) জনগণের সচেতনতা।

২। গত কোন দশকে জেলা শহরের সাথে উপজেলার সংযোগ স্থাপনের ফলে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার বেশ উন্নতি হয়?
(ক) আশির দশক (খ) নব্বই এর দশক (গ) দুটির কোনটি নয়।

৩। বঙ্গ-ভারতে প্রথম বিমান পথে ডাক পাঠানো হয় --।
ক) ১৯২০ খ) ১৯২৪ গ) ১৯১৮

৪। বাংলাদেশ বিমান গঠিত হয় -- ।
ক) ১৯৭২ সালের ৪ঠা মার্চ খ) ১৯৭২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী গ) ১৯৭২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী

৫। ১৯৭২ সালের ২৮শে এপ্রিল হতে কোন রুটে বিমান চলাচল শুরু হয়?
ক) ঢাকা - চট্টগ্রাম খ) ঢাকা - কলকাতা গ) ঢাকা - যশোহর

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ বিমান এর ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করুন। বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে প্রধান বিমান পথ উল্লেখ করুন।

২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কি প্রভাব রাখে?

৩. বাংলাদেশের বিমান পথের গুরুত্ব লিখুন।